ইসলামী আন্দোলন ঃ

কর্মীদের ৭ দফা

অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশকঃ
অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

প্রকাশকালঃ
জুলাই ১৯৯২

দ্বিতীয় প্রকাশঃ
মে ১৯৯৩

তৃতীয় প্রকাশ ঃ
মে ১৯৯৪

চতুর্থ প্রকাশঃ
জুলাই ১৯৯৫
আষাঢ় ১৪০২
শফর ১৪১৬

মূল্য ঃ
সাদা- এগার টাকা মাত্র
নিউজ- সাত টাকা মাত্র

মুদ্রণেঃ
আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, এলিফেন্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

ইসলামী আন্দোলন ঃ কর্মীদের ৭-দফা

পটভূমি

১৯৮০ সাল থেকে ৮১ সাল এবং ৮৩ সাল থেকে ৮৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের বেশ কয়টি জিলায় সাংগঠনিক সফর করে রুকন ও নাযিম সম্মেলন, সাথি পর্যায় পর্যন্ত ইসলামী ছাত্র শিবিরের বৈঠক, মহিলা ও ছাত্রীদের বৈঠক এবং সুধী সমাবেশে হাযির হবার সুযোগ পেয়েছি। এ সবই ঘরোয়া পরিবেশে করতে হয়েছে। জামায়াত ও শিবিরের কর্মী সম্মেলন করতে হলে কোন মিলনায়তনে জায়গা হয় না বলে উপরোক্ত প্রোগ্রামেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। কোন কর্মী সম্মেলন করা সম্ভব হয়নি।

৮৬ সালের নভেম্বরে ঝিনাইদহে সর্ব প্রথম এক ময়দানে বিরাট কর্মী সম্মেলনে আমার বক্তব্য রাখার পর সরকার আমার সফর বন্ধ করে দেন। ৪ বছর আমি সফর করতে পারিনি। ৯০ এর ডিসেম্বরে এরশাদ সরকারের পতনের পর ৯১ সালে আবার আমার সফর শুরু হয়। কিন্তু ৯২ এর শুরু থেকেই জামায়াত-শিবিরকে নির্মূল করার অদ্ভুত অভিযান চলায় সফর বন্ধ থাকে। ২৪ শে মার্চ আমাকে গ্রেফতার করা হয়।

সফরে ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত ভাই-বোনদের কাছে নিম্নলিখিত বিষয়ে আমি বক্তব্য পেশ করতাম।

১। ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করতে পারাটা যে আল্লাহর কত বড় রহমত ও নিয়ামত তা উপলব্ধি করানো।

২। এ আন্দোলনের কর্মীদের যাবতীয় কর্ম তৎপরতার পেছনে যে সহীহ নিয়ত থাকা দরকার তার ব্যাখ্যা।

৩। এ আন্দোলনে আসার উদ্দেশ্য হাসিল করতে হলে আল্লাহ তাআলার সাথে এবং সংগঠনের সাথে কেমন সম্পর্ক রাখতে হবে এর ধারণা দেয়া।

৪। আমাদের মন-মগজ চরিত্রকে ইসলামী আদর্শে 'গড়ে' তুলবার জন্য রিপোর্ট বইতে যে সুচিন্তিত রুটীন দেয়া হয়েছে এবং সংগঠন পদ্ধতি বইতে কাজের যে নিয়ম রয়েছে সে সব নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে

মেনে চললে আল্লাহ তায়ালার নিকট কী কী মর্যাদা আশা করা যায় এর বিবরণ।

এ চারটি বিষয় ৭টি দফায় আমি ব্যাখ্যা করে থাকি। ১ নং থেকে ৩ নং পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ই এক এক দফা হিসাবে গণ্য। আর চতুর্থ বিষয়টিতে মু'মিনের জন্য যে চারটি মর্যাদার কথা কুরআন পাকে রয়েছে এর এক একটিকে এক এক দফায় তুলে ধরা হয়। এভাবে মোট ৭টি দফায় এ বিষয়গুলো আমি ব্যাখ্যা করি।

জেলখানায় বন্দী হয়ে যাবার পর আমি মনে মনে গুমরে মরছিলাম যে আন্দোলনের প্রধান দায়িত্ব আমার উপর থাকা সত্বেও বিরাট কর্মী বাহিনীকে আমি যা বলতে চাই তা পৌছাতে পারছিনা। সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি কারাগারে আটক থাকলেও আমার বক্তব্য লিখিত আকারে বাইরে পাঠিয়ে দেব যাতে কর্মীদের কাছে পৌছে যায়। তাহলে আমি কিছুটা সান্তনা পাব। ব্যক্তিগতভাবে হাযির হয়ে নিজের মুখে এ কথাগুলো আল্লাহর পথের মুজাহিদকে শুনাতে পারলে যে তৃপ্তি পেতাম তা থেকে বঞ্চিত থাকলেও অন্ততঃ আমার বক্তব্য তাদের কাছে পৌছে যাবে, এ আশায় কলম ধরলাম।

আল্ হামদু লিল্লাহ, ৯২ এর মে মাসেই আমার লেখাটি তৈরী হয়ে যায়। আমি বন্দীদশায় থাকলেও আমার বক্তব্য মুক্ত ময়দানে পৌছে গেল এবং জুলাই মাসেই মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হলো। আমার জেলে থাকা অবস্থায়ই ৯৩ এর মে মাসে এর দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়ে গেল। এখন তৃতীয় সংস্করণের জন্য আমি এ ভূমিকা লিখছি।

এ বইটি যে শিরোনামে এখন প্রকাশিত হচ্ছে এটাই আমার দেয়া নাম। ইতিপূর্বে "৭-দফা" কথাটি থাকলেও পূরো নামটি এভাবে ছাপা হয়নি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইন-শা-আল্লাহ এদেশে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন একদিন অবশ্যই কায়েম হবে। কিন্তু যে গতিতে সৎলোক তৈরী হচ্ছে তাতে দেরী হয়ে যাবে বলে আশংকা বোধ করছি। এ বইটি দ্বারা যদি গতি বৃদ্ধিতে সহায়তা হয়, তাহলে আমার শ্রম সার্থক মনে করব। আল্লাহ পাক আমার সে আশা পূরণ করুন- এ দোয়াই করছি। আমীন।

মগবাজার, ঢাকা
মে, ১৯৯৪।

গোলাম আযম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীনকে কায়েম করার উদ্দেশ্যে যারা সংগঠনে যোগদান করে এবং সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, তাদের উপরই শয়তান সবচেয়ে বেশী ক্ষিপ্ত। কারণ শয়তানের রাজত্বের ক্ষতি করার যোগ্যতা তাদেরই। তারা আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম করতে চেষ্টা করে। যদি তারা সফল হয়, তাহলে শয়তানের রাজত্ব টিকতে পারে না।

অবশ্য শয়তান সব ঈমানদারকেই গুমরাহ করার চেষ্টা করে এবং তাদেরকে নেক আমল থেকে ফিরিয়ে রাখার সব রকম তদবীর চালায়। কিন্তু শুধু ঈমান ও আনুষ্ঠানিক আমলের দ্বারা শয়তানের রাজত্বের তেমন কোন ক্ষতি হয়না। শয়তানের শাসন ব্যবস্থার অধীনে যে সব ঈমানদার ও সৎলোক বাস করে, তাদের উপর শয়তান অসন্তুষ্ট হলেও ক্ষিপ্ত হয় না। কারণ তারা শয়তানের রাজ্যের বিদ্রোহী নয়।

ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীকে শয়তান বিদ্রোহী ও চরম দুশমন মনে করে। তাই হাজারো ফন্দি-ফকির ও ষড়যন্ত্র করে কর্মীদেরকে এ পথ থেকে সরাবার চেষ্টা করে। যদি সরাতে না পারে, তাহলে কর্মীদের নিয়তে ভেজাল মিশাবার চেষ্টা করে এবং কর্মীদের মধ্যে বিভেদ ও ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালায়। আর মানুষের মধ্যে যারা শয়তানের খলীফা, চেলা ও শাগরিদ তারাও দুনিয়ার লোভ দেখিয়ে বা বাতিল শক্তির ভয় দেখিয়ে কর্মীদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে।

তাই শয়তান ও শয়তানের শাগরিদদের চালাকী, ধোকা, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অত্যন্ত সতর্ক থাকা দরকার। আল্লাহ পাক বলেনঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ـ

"শয়তান তোমাদের দুশমন, তাকে দুশমনই মনে করবে।

(সূরা ফাতির ৬ আয়াত)

আদম (আঃ) শয়তানকে যদি দুশমন মনে করতেন তাহলে ধোকায় পড়তেন না। শয়তান অতি শুভাকাংখী সেজে যে পরামর্শ দিল তা তিনি কবুল করতেন না যদি বুঝতেন যে, সে দুশমন। দুশমনের পরামর্শ কোন অবস্থায়ই গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই আল্লাহর কথা অমান্য করা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করা থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য যে যত 'মিষ্ট পরামর্শ' ও 'সুবুদ্ধিই' দিক, তা যে শয়তানের ধোকা সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে আল্লাহর পথে মযবুত হয়ে টিকে থাকতে হলে সচেতনভাবে সব সময় ও সব অবস্থায় মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর পথে আসতে পারা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। এ পথে আসবার উদ্দশ্যে বা নিয়তে যেন কোন ভেজাল না থাকে, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। ইসলামী আন্দোলনে আসার পর আল্লাহ তাআলা জান ও মালের কী ধরনের কুরবানী দাবী করেন তা বুঝতে হবে। এ পথে চলার ফলে কোন্ কোন্ যোগ্যতা ও গুণ অর্জন করতে হবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। এ কয়টি বিষয়ই ৭টি দফায় আলোচনা করা হচ্ছে। দফাগুলোর নাম কুরআন শরীফ থেকেই নেয়া হয়েছে।

১নং দফাঃ আল হামদু লিল্লাহ

الحمد لله

'আল হামদু লিল্লাহ' আল্লাহ তাআলার প্রতি শুকরিয়া জানাবার সবচেয়ে সুন্দর ভাষা। আল্লাহ পাক নিজেই এ ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। এর শাব্দিক অর্থ হলো 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।' রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

اَلْحَمْدُ رَاْسُ الشُّكْرِ مَا شَكَرَ اللّٰهَ عَبْدٌ لَا يَحْمَدُهٗ (المشكوٰة)

"আল হামদু হলো শুকরিয়ার মাথা (প্রধান শুকরিয়া), যে বান্দাহ আল্লাহর প্রশংসা করল না সে আল্লাহর শুকরিয়াও আদায় করল না।"

আল্লাহ পাক আমাদের দেহের মধ্যেই অগণিত নিয়ামত দান করেছেন। আর আমাদের জন্য তাঁর সৃষ্টিজগতে যে কত নিয়ামত দিয়েছেন তা গুণে শেষ করা যাবে না বলে কুরআনে বারবার ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু একটি নিয়ামত এমন রয়েছে যার কোন তুলনা নেই। আর সব নিয়ামত একত্র করলেও ঐ

একটি নিয়ামতের সমান হতে পারে না। সে মহা নিয়ামতটি হলো দীন–ইসলাম। দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির একমাত্র উপায়ই হলো এ নিয়ামত।

কুরআন মজীদের একটি সূরার নাম 'আর রাহমান', রাহমান অর্থ মেহেরবান, দয়ালু, করুণাময়। এর সাথে আলিফ ও লাম যুক্ত হয়ে আর রাহমান শব্দ হয়েছে। এর অর্থ হলো সকল দয়া ও করুণার আধার ও উৎস। এ সূরার শুরুতেই বলা হয়েছেঃ اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ।

অর্থাৎ তিনিই আর রাহমান যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআনেই ইসলামের নীল নকশা দেয়া হয়েছে যার ভিত্তিতে রাসূল (সাঃ) ইসলামের পূর্ণ রূপ বাস্তবে কায়েম করেছেন। এ আয়াতটি থেকেই একথা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর সবচেয়ে বড় নিয়ামতই ইসলাম। ইসলামের চেয়ে বড় দয়ার দান আর কিছুই নয়।

সুতরাং আমরা যারা ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করার সৌভাগ্য লাভ করেছি তাদের পয়লা কর্তব্যই হলো এর জন্য মেহেরবান মাবূদের শুকরিয়া আদায় করা। এ আন্দোলনে আসার আগে আমরা ইসলামকে শুধু একটি ধর্মই মনে করতাম। জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহকে একমাত্র মনিব মেনে তাঁর হুকুম পালন করতে হবে এবং তাঁর রাসূলকে একমাত্র নেতা মেনে শুধু তাঁর তরীকা মতো চলতে হবে–এমন কথা আগে জানা ছিল না। ঈমান, ইসলাম, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও জিহাদের হাকীকত জানতাম না। এসবকে শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলেই মনে করতাম।

ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী সরকার, ইসলামী আইন কায়েম করার চেষ্টা করা ঈমানদারদের সবচেয়ে বড় ফরয এ উদ্দেশ্যে ইসলামী সংগঠনভূক্ত হয়ে কাজ করাও ফরয এবং কুরআনের আইন শুধু তিলাওয়াতের জন্য নয়, আল্লাহর আইন মানুষের তৈরী আইনের অধীনে থাকার জন্য আসেনি, ইসলামকে বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়েই রাসূল (সাঃ)–কে পাঠানো হয়েছে– এ সব বিপ্লবী কথা এ আন্দোলনের বাইরে আলেম সমাজ থেকেও কোনদিন শুনিনি।

ইসলামী আন্দোলনে এসে ইসলামকে আল্লাহর দেয়া পূর্ণাংগ একমাত্র জীবন বিধান হিসাবে জেনে ঈমানের যে স্বাদ পেলাম এর জন্য শুকরিয়া আদায়

করে কি শেষ করা যাবে? তাই প্রাণভরে আজীবন আল হামদু লিল্লাহর তাসবীহ জপতে থাকব। এটাই আমাদের পয়লা দফা।

আল্লাহ তাআলার মেহেরবানী না হলে কেউ হিদায়াত পায় না। তিনি হিদায়াতের তাওফীক দিলেই দীনের পথে চলা সম্ভব হয়। একথা হামেশা মনে থাকলে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়ার জযবা তাজা থাকে। হিদায়াত পাওয়ার জন্য শুকরিয়ার এ জযবা দুনিয়ায়ই শেষ হয়ে যাবেনা। বেহেশতেও শুকরিয়ার এ জযবা জারী থাকবে বলে কুরআন পাকে উল্লেখ রয়েছে।

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ

"বেহেশতবাসীরা বলবে, ঐ আল্লাহরই সকল প্রশংসা যিনি এ পথে আমাদেরকে হিদায়াত করেছেন। আল্লাহ যদি হিদায়াত না করতেন, তাহলে আমরা কখনও হিদায়াত পেতাম না।" (সূরা আল আরাফ ৪৩ আয়াত)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, বেহেশতের নিয়ামত পেয়ে বেহেশতবাসীরা নিজেদের বাহাদুরী প্রকাশ করে বলবে না যে, আমরা নেক আমল করার কারণেই আজ এ নিয়ামতের ভাগী হয়েছি। বরং এ নিয়ামতের কৃতিত্ব যে আল্লাহর সে কথাই তারা স্বীকার করবে। তাই হিদায়াত পাওয়ার জন্য শুকরিয়া স্বরূপ আলহামদু লিল্লাহ জপতে থাকাই উচিত। শুকরিয়ার গভীর ও আন্তরিক অনুভূতি নিয়ে নামাযের পর এ তাসবীহ তৃপ্তির সাথে উচ্চারণ করলে মনের শান্তি আরও বেড়ে যাবে।

সব সময় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার জন্য রাসূল (সাঃ) এমন সব দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন যা 'আলহামদু লিল্লাহ' দিয়ে শুরু করা হয়েছে।

যেমনঃ

ঘুম থেকে জেগে — اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য যিনি মৃত্যুর পর আমাদের জীবিত করেছেন। আর তাঁর দিকেই আমরা ফিরে যাবো।"

পায়খানা পেশাবের পর — اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّي الْاَذٰى وَعَافَانِيْ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যিনি তাকলীফ দুর করেছেন এবং মুক্তি দিয়েছেন।

খাওয়ার পর — اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার যিনি আমাদের পানাহার করিয়েছেন এবং মুসলমানদের মধ্যে শামিল করেছেন।"

যান বাহনে উঠে — اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ -

অর্থ- সব প্রশংসা আল্লাহর, পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সত্তার, যিনি আমাদের জন্য এটিকে অনুগত করে দিয়েছেন। আমরা এর উপর ক্ষমতাবান ছিলাম না এবং নিশ্চয়ই আমরা আমাদের 'রব'-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করব।

২নং দফা: রিদওয়ানুল্লাহ

رضوان الله

রিদওয়ানুল্লাহ শব্দটি কুরআন পাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি বা রিযামন্দি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য এ দফাটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। কে কী নিয়তে কাজ করেছে সেটা বিচার করেই আল্লাহ মানুষের আমলের বদলা দেবেন। নিয়ত সহীহ না হলে কোন ভাল কাজেরও পুরস্কার পাওয়া যাবে না। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন

"নিশ্চয়ই সব আমল নিয়তের দ্বারাই বিচার্য।" — اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ -

তাই ইসলামী আন্দোলনের প্রত্যেক কর্মীকে নিজের দিলের হিসাব নিতে হবে যে আমি কী নিয়তে বা কোন্ উদ্দেশ্যে এ পথে এসেছি। আমি কি নিজের কোন স্বার্থ হাসিল করার জন্য আন্দোলনে এসেছি? দুনিয়ার কোন লাভের আশায় কি এ সংগঠনে যোগ দিয়েছি? যদি এমন কোন স্বার্থ বা লোভ মনে থাকে, তাহলে তা সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হবে। কারণ এ ভুল নিয়ত নিয়ে এখানে বেশী দিন টিকতে পারবে না। এক সময় ছাঁটাই হয়ে পড়তে হবে।

একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার আশায়ই এ আন্দোলনে আসতে হবে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের দরকার কী? যারা দুনিয়ার জীবনের সুখ-সুবিধাকেই আসল পাওয়ার জিনিস মনে করে তাদের নিকট আল্লাহর সন্তুষ্টির গুরুত্ব নেই। কিন্তু যারা আখিরাতের অনন্ত অসীম জীবনে সুখ-শান্তির জন্য পেরেশান, তাদের জন্য "রিদওয়ানুল্লাহ" বড়ই জরুরী।

আমরা যারা কবরের আযাব, ময়দানে হাশরের হয়রানি ও দোযখের কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে চাই এবং বেহেশতের সুখ ভোগ করতে আগ্রহী, তাদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির ঠেকা বড় জবর ঠেকা। কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া ঐ সবের কোনটাই পাওয়ার আশা করা যায় না।

কুরআন ও হাদীস এবং রাসূল (সাঃ) ও সাহাবা কিরামের (রাঃ) জীবন একথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহর যমীনে মানুষের মনগড়া আইন চালু থাকা অবস্থায় শুধু নামায-রোযা দ্বারাই আল্লাহ সন্তুষ্ট হন না। আল্লাহর আইন চালু করার সংগ্রাম করতে গিয়ে বাতিলের সাথে আপোস করা ঈমানের বিরোধী। রাসূল (সাঃ) এর যুগে যারা নামায-রোযা করতো কিন্তু বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই এড়িয়ে চলতো, তাদেরকে মুনাফিক বলা হয়েছে। তাই আমাদের ঈমানের তাকীদেই আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে ইকামাতে দীনের আন্দোলনে সক্রিয় থাকতে হবে।

সূরা আলে ইমরানের ১৭৩ ও ১৭৪ আয়াতে বলা হয়েছে যে, একদল মুসলমানের ভুলের কারণে উহুদ যুদ্ধে পরাজয় হওয়ার পরপরই রাসূল (সাঃ) যখন আবার দুশমনদের উপর হামলা করার জন্য মুসলিম বাহিনীকে ডাক দিলেন, তখন মুনাফিকরা তাদেরকে এই বলে ভীত করার চেষ্টা করল যে, দুশমনদের বিরাট বাহিনীর সমাবেশ হয়েছে। এ কথা শুনার পর মুজাহিদরা ভীত হওয়ার পরিবর্তে তাদের ঈমান আরও বেড়ে গেল এবং তারা এই বলে জিহাদের ময়দানে এগিয়ে গেল যে حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

(আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ অভিভাবক)।

ফলে তাঁরা সে যুদ্ধে আর কোন ক্ষতি হওয়া থেকে বেঁচে গেলেন, আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে নিরাপদে ফিরে এলেন এবং وَاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ

(তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলার গৌরবও লাভ করলেন)।

এভাবেই দেখা যায় যে, যারা নিষ্ঠার সাথে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেদের জান-মাল আল্লাহর পথে কুরবান করে, তাদেরকে তিনি বিজয়ী করেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক দান করেন।

৩নং দফাঃ বাইয়াত বিল্লাহ
بيعت بالله

বাইয়াত মানে বিক্রয়। বাইয়াত বিল্লাহ অর্থ আল্লাহর কাছে বিক্রয়। ইসলামী আন্দোলনে নিয়ত ঠিক রেখে নিঃস্বার্থভাবে দায়িত্ব পালন করতে হলে আমাদের জান ও মাল আল্লাহর মরযী মতো ব্যবহার করতে হবে। জান ও মাল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে খরচ করার জন্য আমাদেরকে উৎসাহ দেবার উদ্দেশেই সূরা আত তাওবার ১১১ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ-

"নিশ্চয় আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন।"

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, বেহেশত পেতে হলে আমার জান ও মাল আল্লাহর কাছে বিক্রয় করতে হবে। অর্থাৎ আমার জান ও মালের কর্তা আমি নই, আল্লাহ-এ কথা মনে করে আমাকে চলতে হবে। আমার নফসের মরযী মতো জান ও মাল ব্যবহার করলে বেহেশত পাওয়ার কোন আশা নেই।

জযবা ও আবেগ নিয়ে জান-মাল আল্লাহর কাছে বিক্রয় করেছি বলে যতই আমরা মনে করি বাস্তবে আল্লাহর মরযী মতো জান, মাল কাজে লাগানো সহজ নয়। কারণ নফস ধোকা দেয়। পরিবার ও আত্মীয়, স্বজন চাপ দেয়, আর শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়। ফলে আল্লাহর মরযী মতো চলা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। এ সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যই ইসলামী সংগঠনের নিকট বাইয়াত হতে হয়। আল্লাহর নিকট বাইয়াত মানে বিক্রয়। কিন্তু সংগঠনের নিকট বাইয়াত অর্থ শপথ। এ শপথের সার কথা হলো, "আমার যে জান ও মাল আল্লাহর নিকট বিক্রয় করে দিয়েছি তা আমার হাতে রেখে খরচ করতে চাইলে নফসের ধোকায় পড়ে, পরিবার ও আত্মীয়ের চাপে এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসায় আল্লাহর মরযী মতো ব্যবহার করতে পারবো না। তাই আমি এ বিষয়ে আমাকে

সাহায্য করার জন্য জান ও মাল আল্লাহর মরযী মতো ব্যবহার করার ইখতিয়ার সংগঠনের হাতে তুলে দিলাম। আমার জান ও মালের ব্যাপারে সংগঠন শরীয়ত মতো যে সিদ্ধান্ত দেবে তা আমি মেনে চলব বলে ওয়াদা করলাম।"

"বাইয়াত বিল্লাহর" দাবী পুরণের জন্য সংগঠনের নিকট বাইয়াত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। এটাই নিরাপদ ব্যবস্থা।[১] একারনেই সাহাবাকিরাম (রাঃ)– রাসূল (সাঃ)– এর নিকট এবং পরবর্তীতে খলীফাগণের নিকট বাইয়াত হয়েছেন।

শাহাদাতের জযবা

বাইয়াত বিল্লাহর মানেই হলো জান ও মাল আল্লাহর পথে কুরবান করার ঘোষণা। কুরআন পাকে এ ঘোষণাটি সূরা আল আনয়ামের ১৬১ নং আয়াতে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে,

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"আমার নামায আমার যাবতীয় ইবাদাত আমার হায়াত ও মওত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।" এটাই শাহাদাতের জযবার সুন্দর প্রকাশ।

আমাদের কর্তব্য হলো আমাদেরকে আল্লাহর দীন কায়েমের পথে উৎসর্গ করে শাহাদাতের জযবা নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে থাকা। আমার নিকট থেকে দীনের খেদমত কিভাবে ও কতটুকু নেবেন তা আমার মা'বূদের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। তিনি আমাকে বাতিলের হাতে নিহত হয়ে শহীদ হবার সহজ গৌরব দান করবেন, না ইসলামের বিজয়ের পর আল্লাহর আইন জারী করার কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করবেন, তা সম্পূর্ণ তাঁরই মরযী। নিশ্চিন্ত মনে আমাকে উভয় অবস্থার জন্য তৈরী থাকা উচিত।

উহুদের যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শহীদ হন এবং বদরের যুদ্ধে বিজয়ের পর এটা পরাজয় বলেই গণ্য। এ যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা মন্তব্য করেছেন যে,

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ط وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا

[১] আমার লেখা "বাইয়াতের হাকীকত" নামক পুস্তিকাটিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যাতে কোন খটকা বাকী না থাকে।

بَيْنَ النَّاسِ ج وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ٥

"তোমাদের উপর যদি আঘাত এসে থাকে, তাহলে দুশমনদের উপরও (বদরে) এমনি আঘাত এসেছিল। এটা সময়ের উঠানামা যা মানুষের মধ্যে আমি ঘুরিয়ে–ফিরিয়ে আনি। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ দেখতে চান যে, তোমাদের মধ্যে সত্যিকার মু'মিন কারা। আর তোমাদের থেকে কিছু লোককে শহীদ হওয়ার মর্যাদা তিনি দিতে চান। আল্লাহ যালিমদেরকে পছন্দ করেন না"।

(সূরা আলেইমরান ১৪০ আয়াত)।

এ দ্বারা বুঝা গেল যে, কিছু লোককে শহীদ হওয়ার সুযোগ দান করাও আল্লাহ পাকেরই পরিকল্পনা।

বদর ও উহুদ যুদ্ধ থেকে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদীনের ৪ জনই প্রতিটি যুদ্ধে শরীক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁদেরকে যে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে হবে সে কথা তাঁদের জানাও ছিল না। তাই ঐ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে তারা গা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন বলে মনে করার কোন কারণ নেই। কে শহীদ হবে কে গাযী হবে তার ফায়সালা একমাত্র আল্লাহই করেন।

বর্তমানেও ইসলামী আন্দোলনে ছাত্র ও অছাত্র যারা শহীদ হচ্ছেন, তাদেরকে আল্লাহ পাকই এ উদ্দেশ্যে বাছাই করে নিয়েছেন। বাতিলের সাথে সংঘর্ষ হচ্ছে দেখে ভীত হয়ে পিছিয়ে থাকা বাইয়াত বিল্লাহর সম্পূর্ণ খেলাফ এবং তা মুনাফিকীর স্পষ্ট আলামত। আবার এদিকেও খেয়াল রাখতে হবে যে, শহীদ হবার প্রবল আকাংখা নিয়ে বিনা পরিকল্পনা ও সংগঠনের সিদ্ধান্ত ছাড়াই দুশমনের হাতে জান তুলে দেয়াও সঠিক জযবা নয়। তবে যারা আখিরাতে শাহাদাতের মর্যাদা কামনা করে, তাদের জন্য রাসূল (সাঃ) সুসংবাদ দিয়েছেন যে, শাহাদাতের জযবা নিয়ে যে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে থাকবে, সে যদি নিজের বিছানায়ও মারা যায় তবুও আখিরাতে আল্লাহ তাকে শহীদ বলে গণ্য করবেন। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য এর চেয়ে বড় সুসংবাদ আর কী হতে পারে?

বাকী চার দফার কথা

আলহামদু লিল্লাহ, রিদওয়ানুল্লাহ ও বাইয়াত বিল্লাহ- এ তিনটি দফা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীকে আল্লাহর পথে সদা তৎপর রাখবে বলে আশা করা যায়। এরপরও এ প্রশ্ন থাকে যে, এ পথে চলে আমি বাস্তব জীবনে দুনিয়ার কোন্ ধরনের সফলতা লাভ করব? এখানে পার্থিব লাভের প্রশ্ন তোলা হয়নি। দীনের দিক দিয়েই আমি কতটুকু উন্নতি করতে পারব?

এখানে মনে রাখতে হবে যে মানুষ সফলতার আশায়ই তার শ্রম, সময়, অর্থ, আবেগ, মেধা ইত্যাদি খরচ করে। সফলতার টারগেট ছাড়া কাজের জযবা পয়দা হয় না এবং উৎসাহ স্থায়ী হয় না। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সফলতার হিসাব দু'ভাবে করতে হবেঃ একটা হলো ব্যক্তিগত সফলতা, আর একটা হলো আন্দোলন ও সংগঠনের সফলতা। আন্দোলনের সফলতা দীন বিজয়ী হওয়া বা ইসলামী সরকার কায়েম হওয়ার উপর নির্ভর করে। কিন্তু কর্মীর সফলতা ঐ বিজয়ের উপর নির্ভর করে না। কর্মীর সফলতা হলো ঐ বিজয়ের চারটি মর্যাদা লাভ করা যা মু'মিনদের জন্য আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেছেন। ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমেই ঐ সব মর্যাদা হাসিল করা সম্ভব। ঐ চারটি মর্যাদাই বাকী ৪ দফা।

৪ নং দফাঃ ইবাদুল্লাহ

عباد الله

ইবাদুল্লাহ মানে আল্লাহর দাসগণ। আবদ মানে দাস। এর বহুবচন হলো ইবাদ। দাসের কাজ হলো মনিবের হুকুম মেনে চলা। হুকুম মানতে হলে পয়লা জানতে হবে যে মনিব কী কী হুকুম করেছেন।

ইসলামী আন্দোলন তার কর্মীর জন্য যে রুটীন দিয়েছে তা আল্লাহর গোলাম বা বান্দাহ হবারই সুযোগ করে দেয়। এ রুটীন যারা পালন করে তারাই শুধু কর্মী বলে গণ্য হয়। এ রুটীন অনুযায়ী সপ্তাহ ভরা দু'রকম কাজ করতে হয় এবং এ কাজের রিপোর্ট সংগঠনকে দিতে হয়। এক রকম কাজ হলো কর্মীকে আল্লাহর দাস হিসাবে গড়ে উঠবার উদ্দেশ্যে। অপরটি হলো অন্যদেরকে এ পথে আনার চেষ্টা।

আল্লাহর দাস হিসাবে গড়ে উঠতে হলে দীনের ইলম্ দরকার এবং যতটুকু ইলম হলো সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। তাই রুটীন অনুযায়ী রোয কুরআনের কয়েক আয়াত বুঝে পড়া, কমপক্ষে একখানা হাদীস শেখা, ১০ পৃষ্ঠা ইসলামী বই পড়া, জামায়াতে নামায আদায় করা কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক। সাপ্তাহিক বৈঠকে আরও কিছু শেখার সুযোগ হয়। সংগঠন কুরআন শুদ্ধ করে পড়া ও মাসলা মাসায়েল শেখার উপরও জোর দেয়। এভাবেই আল্লাহর বান্দাহ হিসাবে গড়ে উঠবার মহা-সুযোগ সংগঠনে রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সংগঠন কর্মীদের জন্য নিয়মিত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে। অগ্রসর কর্মীদের জন্য বিশেষ ট্রেনিং-এর ব্যবস্থাও করা হয়।

ইবাদুল্লাহর মর্যাদা পেতে হলে এ মযবুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমি নফসের গোলামী করব না। নফস মানে দেহের দাবী। দুনিয়ার সব রকম মজাভোগ করার জন্য দেহ দাবী জানাতেই থাকে। কিন্তু রূহ বা বিবেক তার মন্দ দাবীর প্রতিবাদ করে। ভাল ও মন্দ সম্পর্কে সব মানুষই জানে। তাই নাফস মন্দ কাজের হুকুম করলে বিবেক আপত্তি জানায়। নফস যদি রূহের চেয়ে বেশী সবল হয়, তাহলে বিবেকের আপত্তি সত্ত্বেও নফসের দাবী অনুযায়ী মন্দ কাজ করা হয়ে যায়।

তাই নফসের দাসত্ব থেকে নিজেকে রক্ষা করে আল্লাহর সত্যিকার দাস হতে হলে ৩টা কাজ করতে হবেঃ

১। এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, রূহের মতের বিরুদ্ধে কিছুতেই চলব না। নফসকে আমার মনিব হতে দেব না।

২। জামায়াতে নামায আদায় করে ও রমযানে রোযা রেখে এবং শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে ও প্রতি মাসে ২/৩টা করে নফল রোযা রেখে রূহকে নফসের উপর শক্তিশালী করতে হবে।

৩। সব সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন রূহ ও নফসের এ লড়াইতে নফস কোন সময় জয়ী হতে না পারে, যদি কোন সময় জয়ী হয়ে যায়, তাহলে সংগে সংগে তাওবা করতে হবে।

৫নং দফাঃ আওলিয়াউল্লাহ

اولياء الله

আউলিয়া শব্দটি ওয়ালীর বহুবচন। ওয়ালী অর্থ সাহায্যকারী, বন্ধু, অভিভাবক, সমর্থক, রক্ষক, পৃষ্ঠপোষক ইত্যাদি। ওয়ালী শব্দটি আল্লাহর জন্যও ব্যবহার করা হয়, আল্লাহর বান্দাহর জন্যও ব্যবহার করা হয়। যেমন,

"যারা ঈমানদার আল্লাহ তাদের অলী - اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

আল্লাহ মু'মিনদের ওয়ালী" - وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ

نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ج

'আমি (আল্লাহ) দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের ওয়ালী"

ওয়ালী শব্দটি বান্দাহর জন্য ব্যবহার করার উদাহরণঃ

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

"জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়ালীদের কোন ভয় ও হতাশা নেই।"

এ শব্দটি যখন আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা হয়; তখন এর অর্থ হয় অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারী। আর যখন আল্লাহর বান্দাহর জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন এর অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহর স্নেহভাজন বন্ধু। কোন মানুষকে আল্লাহর ওয়ালী বললে তাকে আল্লাহর অতি আদরের বান্দাহ ও স্নেহের দাসই মনে করতে হবে। অর্থাৎ সাধারণ দাস নয়, প্রিয় দাস বা পেয়ারা বান্দাহ।

একই শব্দ আল্লাহ ও বান্দাহর জন্য ব্যবহার করার আর একটি উদাহরণ হলো 'মু'মিন' শব্দ। ঈমানদার মানুষকে মু'মিন বলা হয়। আবার কুরআনে আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে মু'মিন শব্দটিও রয়েছে।

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ -

এখানে মু'মিন অর্থ নিরাপত্তাদাতা বা নিরাপত্তা বিধানকারী। এ শব্দটি যখন মানুষের জন্য ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ হবে 'যে নিরাপত্তা পেল' বা

নিরাপদ হলো। امن শব্দ থেকেই ঈমান ও মু'মিন শব্দ গঠিত হয়েছে। আমন মানে নিরাপত্তা।

আল্লাহর ওয়ালীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ

১। আল্লাহর হুকুমকে মহব্বতের সাথে পালন করা। সাধারণ বান্দাহরা আল্লাহকে ভয় করে তাঁর হুকুম মেনে চলে। এটাকে বলা হয় তাকওয়া। মহব্বত করে পালন করাকে ইহসান বলা হয়। [২] মনিবের শাস্তির ভয় থেকে বাঁচার জন্য যদি কাজ করা হয়, তাহলে সে কাজ এত সুন্দর হয় না, মহব্বতের সাথে করলে যত সুন্দর হয়।
তাকওয়া ও ইহসানে এটাই পার্থক্য। আল্লাহর সাধারণ দাস ও আল্লাহর ওয়ালীর মধ্যে এখানেই পার্থক্য।

২। কোন অবস্থায়ই আল্লাহর নাফরমানী না করা। আল্লাহর হুকুম দু'রকম। একটা হলো আদেশ, অপরটি নিষেধ।

আল্লাহর সব আদেশ পালন করার সুযোগও সবার হয় না। যাকাত ও হজ্জ পালন করা শুধু ধনীর পক্ষেই সম্ভব। ইনসাফ কায়েম করা, যালিমকে শাস্তি দেয়া, বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যোগ্যতা, সুযোগ ও দায়িত্ব সবার নেই।

কিন্তু আল্লাহর নিষেধগুলো মেনে চলা সবার পক্ষেই সম্ভব। অর্থাৎ আল্লাহর সব আদেশ পালন করতে না পারলেও সব নিষেধ পালন করা যায়। আল্লাহর সব নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয় কাজ না করা বা তা হতে নিজকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য টাকা পয়সার দরকার হয় না। মযবুত ইরাদাই এর জন্য জরুরী।

আল্লাহর ওয়ালী এ বিষয়ে বড়ই সতর্ক। কোন অবস্থায় যেন এমন কাজ হয়ে না যায় যাতে আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হন। আল্লাহর খাঁটি মহব্বতই এ যোগ্যতা সৃষ্টি করে। আল্লাহর ওয়ালীদের কথাই হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক এভাবে বলেছেন, "তাদের কান আমার কান

[২] এ বিষয়ে মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর লেখা "ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি" বইটি দেখুন।

হয়ে যায় যা দিয়ে তারা শুনে, তাদের চোখ আমার চোখ হয়ে যায় যা দিয়ে তারা দেখে, তাদের হাত আমার হাত হয়ে যায় যা দিয়ে তারা ধরে, তাদের পা আমার পা হয়ে যায় যা দিয়ে তারা চলে।"

অর্থাৎ তাঁরা তাঁদের অংগ-প্রত্যংগ কখনও আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজে ব্যবহার করে না।

৩। সকল অবস্থায় আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকা। দুনিয়ায় আপদ-বিপদ, দুঃখ-কষ্ট, শোক-তাপ কমবেশী সবার জীবনেই আসে। নবী-রাসূলগণও এ থেকে মুক্ত ছিলেন না। আল্লাহকে মহব্বত করার কারণে সব অবস্থায়ই আল্লাহর ওয়ালী মনে সান্ত্বনা পায় যে, এর মধ্যে নিশ্চয়ই মংগল রয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছায়ই বিপদ আসে। আর তিনি বান্দাহর মংগলের জন্যই সব কিছু করেন। এ বিশ্বাসের কারণে আল্লাহর ওয়ালী কোন কঠিন অবস্থায়ও পেরেশান হয় না, ঘাবড়ায় না বা হতাশ হয় না। আল্লাহর উপর দৃঢ় আস্থা ও আল্লাহর ইচ্ছার উপর পূর্ণ ভরসা থাকায় তাদের মনের অবস্থা হলো যে সব অবস্থায়ই তারা আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জানায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ ـ

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের রুটীনের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আত্ম-সমালোচনা। অর্থাৎ নিজের হিসাব নিজেকেই নেবার ব্যবস্থা। হাদীসে আছে ـ اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ ـ "বুদ্ধিমান ঐ লোক যে নিজের নফসের বিচার করে বা সমালোচনা করে।" এ বিষয়টাই আল্লাহর ওয়ালীর মর্যাদা পেতে সাহায্য করে। কর্মী আত্ম-সমালোচনা করবে ঐ তিনটা পয়েন্টে যা ওয়ালীর বৈশিষ্ট্যে উল্লেখ করা হয়েছে। রোয একটা নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত সে নিজেকে প্রশ্ন করবেঃ

১। আমি কি মহব্বতের সাথে আল্লাহর আদেশ পালন করছি?

২। আমার অংগ-প্রত্যংগকে কি আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ থেকে সব সময় ফিরিয়ে রাখতে পেরেছি?

৩। আমি কি সব সময় আমার মনিবের উপর সন্তুষ্ট থেকে তাঁর শুকরিয়া আদায় করছি?

যে ব্যক্তি নিয়মিত নিষ্ঠার সাথে রোয এভাবে আত্ম-সমালোচনা (ইহতিসাবে নাফস) করতে থাকবে এবং সে অনুযায়ী নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা করবে, তার মধ্যে ধীরে ধীরে ঐ সব গুণ সৃষ্টি হবার আশা করা যায়। আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, আমাদের জীবনের দোষত্রুটি দূর করে এ পথে এগুতে হলে নিজেকেই সাধনা করতে হবে। আর কেউ আমার জন্য এ সাধনা করে দিতে পারবে না।

প্রশ্ন হতে পারে যে, ইসলামী আন্দোলনের কঠিন দায়িত্ব পালনের সাথে পার্থিব কর্তব্য ও পারিবারিক ঝামেলা পোহায়ে আল্লাহর ওয়ালী হবার সাধনা করা কীভাবে সম্ভব? জনগণের মধ্যে দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব পালন না করে সমাজ সেবা ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করার ঝামেলা না পোহায়ে পারিবারিক দায়িত্বের বোঝা এড়িয়ে নির্জনে নফল ইবাদতে যারা মশগুল তাদেরকেই ওয়ালীউল্লাহ বলে মনে করা হয়। এটা প্রচলিত ভুল ধারণা। সাহাবা কিরামের (রাঃ) চেয়ে বড় ওয়ালী আর কে হতে পারে? তাঁদের জীবনই আমাদের আদর্শ। তাঁদের থেকে ভিন্ন ধরনের জীবন মু'মিনদের জন্য আদর্শ হতে পারেনা।

এক সফরে রাসূল (সাঃ)-এর সামনে কয়েকজন সাহাবী তাঁদের এক সাথীর প্রশংসা করছিলেন। রাসূল (সাঃ) প্রশংসার কারণ জানতে চাইলেন। তাঁরা বললেন, এখানে সফর মুলতবী করার সাথে সাথে আমরা সবাই তাঁবু খাটানো, ঘোড়া বাঁধা ও ঘোড়ার খাবার দেয়া, সামানপত্র গুছিয়ে রাখা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আর ঐ ভাইটি এসেই নফল নামাযে মশগুল হয়ে গেলেন। রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের ভাইটির ঘোড়া ও সামান সামলাল কে? তাঁরা বললেন, আমরাই সব কিছু করে দিয়েছি। রাসূল (সাঃ) মন্তব্য করলেন, "তোমরা সবাই তার চেয়ে ভাল।" এ ঘটনাটিই উদাহরণ হিসাবে যথেষ্ট।

যে কারণে সমাজে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের এত অভাব রয়েছে, এমন কি কালেমা তাইয়েবার মর্মকথা পর্যন্ত জনগণ জানে না, সে কারণেই ওয়ালিউল্লাহ সম্পর্কেও মানুষের সঠিক ধারণা নেই। সংসার-ত্যাগী, যিকর-আযকারে মশগুল, সুফীয়ানা লেবাসধারী ও সুন্দর চেহারার কোন লোক দেখলে মানুষ তাকে আল্লাহর ওয়ালী বলে ভক্তি করে। কিন্তু আল্লাহ কাকে তাঁর ওয়ালী বলে গণ্য করেন তা মানুষের জানবার উপায় নেই।

আল্লাহর ওয়ালীর যে কয়টি বৈশিষ্ট্য এখানে আলোচনা করা হয়েছে, তা এমন সব গুণ যা দেখা যাবার জিনিস নয়। তাছাড়া সত্যিকার ওয়ালী যারা তারা মোটেই পছন্দ করে না যে, লোকেরা তাকে ওয়ালী বলে ভক্তি করুক। বরং তারা নিজেদেরকে আল্লাহর নিকৃষ্ট দাসই মনে করেন।

আসল কথা হলো আল্লাহর সাথে গভীর মহব্বত সৃষ্টি করা। শেষ রাতে যখন দুনিয়া ঘুমে মগ্ন, তখন আল্লাহর দুয়ারে ধরনা না দিলে ঐ মহব্বত অনুভব করা যায় না। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, " শেষ রাতে জাগা তোমাদের কর্তব্য। কেননা, এটা সালেহ লোকদের তরীকা, তোমাদের রবের নৈকট্য লাভের উপায়, অতীত গুনাহের কাফফারা ও ভবিষ্যত গুনাহের নিরাপত্তা।"

৬নং দফাঃ আনসারুল্লাহ

انصار الله

আনসার শব্দটি নাসির শব্দের বহুবচন। নাসির মানে সাহায্যকারী। আনসারুল্লাহ মানে আল্লাহর সাহায্যকারিগন। আল্লাহকে সাহায্য করা সম্পর্কে কুরআন শরীফে বহু আয়াত রয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ ـ

"হে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছ যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।" (সূরা মুহাম্মদ ৭ আয়াত)

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ـ

"আল্লাহ জেনে নিতে চান কে-না দেখেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে।" (সূরা আল হাদীদ-২৫ আযাত)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ

"হে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছ; তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও।" (সূরা আস্‌সাফ-১৪ আয়াত)

এ সব আয়াতে আল্লাহকে সাহায্য করার যে তাকীদ রয়েছে এর আসল মর্ম কী? আল্লাহ কি মানুষের সাহায্যের কাংগাল? অসহায় মানুষ সব সময়ই

আল্লাহর সাহায্যের ভিখারী। এ অবস্থায় আল্লাহ মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়ার অর্থ কী? এটা বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ।

আল্লাহর কোন মু'মিন বান্দাহর চেষ্টায় যখন কোন গুমরাহ লোক হিদায়াতের পথ পায়, তখন আল্লাহ কেমন খুশী হন সে কথা বুঝাবার জন্য রাসূল (সাঃ) এক চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। এক লোক বিশ্রাম নেবার জন্য সফর মুলতবী করে এক গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ল। জেগে দেখে তাঁর উটটি নেই। উটের পিঠেই খাবার ও পানীয় রয়েছে। পেরেশান হয়ে তালাশ করে কোথাও না পেয়ে সে চরম হতাশ অবস্থায় অবসন্ন হয়ে মৃত্যু নিশ্চিত মনে করে চোখ বু'জে পড়ে রইল। একটু পরে চোখ মেলে দেখে যে তার উট হাযির। খুশীর চোটে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে গিয়ে সে যা বলতে চেয়েছে তা বে-খেয়ালে উল্টা বলে ফেলেছে। " হে আল্লাহ, আমি তোমার মনিব আর তুমি আমার দাস।" এ লোক হারানো উট পেয়ে যেমন খুশী হয়েছে, তেমনি আল্লাহর কোন গুমরাহ (পথহারা) বান্দাহ হিদায়াত হলে তিনি এর চেয়েও বেশী খুশী হন।

আল্লাহর গুমরাহ বান্দাহদেরকে হিদায়াত করার চেষ্টা করা যে কত বড় ফযীলতের কাজ সে কথা বুঝাবার জন্যই রাসূল (সাঃ) এমন সুন্দর উদাহরণটি দিলেন। অথচ মানুষকে হিদায়াত করার কোন ক্ষমতা নবীদেরকেও দেয়া হয়নি। রাসূল (সাঃ)-এর চাচা আবু তালিব পিতার স্নেহ দিয়ে তাঁকে লালন-পালন করায় এবং নবুয়তের কঠিন সংগ্রামী জীবনে বিরোধীদের মুকাবিলায় মযবুত ঢালের ভূমিকা পালন করায় এ চাচার প্রতি তাঁর গভীর মহব্বত থাকাই স্বাভাবিক। চাচার মৃত্যুকালে তিনি চেষ্টা করলেন যেন তাঁর প্রিয় মুরুব্বী ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হতে পারেন। কিন্তু রাসূল (সাঃ)-এর আশা পূরণ হলো না। আল্লাহ তাআলা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ج

"হে রাসূল আপনি কাউকে মহব্বত করেন বলেই তাকে হিদায়াত করতে পারবেন না। আল্লাহ যাকে চান তাকেই হিদায়াতের তাওফীক দেন।"
(সূরা আল কাসাস, ৫৬ আয়াত)

এ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মানুষের হিদায়াতের পূর্ণ ইখতিয়ার আল্লাহ তাআলার হাতে। হিদায়াত দান করা একমাত্র আল্লাহর কাজ। এ ব্যাপারে নবীর হাতেও ক্ষমতা দেয়া হয়নি। অথচ মানুষের হিদায়াতের জন্যই নবী পাঠান হয়েছে এবং নবীর প্রতি যারা ঈমান আনে তাদের উপরও এ কর্তব্য রয়েছে যেন তারা অন্যদের হিদায়াত পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। এখানেও প্রশ্ন উঠতে পারে যে, হিদায়াত করার ক্ষমতা যাদের হাতে দেয়া হয়নি, তাদেরকে চেষ্টা করার দায়িত্ব কেন দেয়া হলো?

এর জওয়াব এই যে, আল্লাহ তাআলা হিদায়াত কবুল করা বা না করার ব্যাপারে মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। কেউ ইচ্ছা করলে হিদায়াত কবুল করতে পারে। আল্লাহ ঈমান আনার জন্য যেমন কাউকে বাধ্য করেন না, তেমনি গুমরাহ থাকার জন্যও বাধ্য করেন না। কিন্তু যারা হিদায়াত পেতে চায়, তাদেরকে হিদায়াতের পথ দেখাবার ব্যবস্থা তো থাকা দরকার। সে ব্যবস্থাটাই হলো এই যে, তিনি নবী পাঠান হিদায়াতের উপায় দেখাবার জন্য। যারা হিদায়াত কবুল করে, তাদের উপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যে, তারাও যেন নবীদের মতোই অন্য মানুষের হিদায়াত পাওয়ার চেষ্টা করে। এই যে, পথ দেখাবার কাজটা এটা না হলে যারা হিদায়াত কবুল করতে চায়, তারা কেমন করে ঈমান আনবে। হিদায়াতের আসল মালিক যে আল্লাহ সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আল্লাহ তো নিজে আসমান থেকে ওয়ায করার ব্যবস্থা করেননি। তিনি তো নিজে এসে মানুষকে বুঝাবার নিয়ম বানাননি। তাহলে মানুষের হিদায়াত পাওয়ার উপায় কি? দাওয়াত ইলাল্লাহই সে উপায়।

তাহলে এ কথা প্রমাণ হলো যে মানুষকে আল্লাহই হিদায়াতের তাওফীক দেন। কে হিদায়াতের যোগ্য তার ফায়সালা তিনিই করেন। কিন্তু এ ফায়সালা করার জন্য দায়ী ইলাল্লাহর দায়িত্ব যারা পালন করেন, তাদের অবদানকে কোনক্রমেই স্বীকার না করে পারা যায় না। তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে ''আনসারুল্লাহ'' উপাধি দিয়ে তাদের খেদমতের স্বীকৃতি দিলেন।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের রুটীনের প্রথম দিক আত্মগঠনের কাজ যার মাধ্যমে ইবাদুল্লাহ ও আউলিয়াউল্লাহর মর্যাদা হাসিল করতে হয়। ঐ রুটীনের বাকী অংশ হলো দাওয়াতী কাজ। এ কাজের মাধ্যমেই "আনসারুল্লাহর'' মর্যাদা পাওয়া সম্ভব।

কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, "আনসারুল্লাহ" পদবীটা দয়াময় আল্লাহর দেয়া সম্মান। আমরা দাওয়াতী কাজ করি বলে নিজেদেরকে আনসারুল্লাহ বলে দাবী যেন না করি। ফরয কাজ মনে করে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার নিয়তেই আমাদেরকে এ কাজ করতে হবে। যেহেতু মূলতঃ কাজটা আল্লাহর, সেহেতু তিনি দয়া করে আনসারুল্লাহ উপাধি দিয়েছেন।

আরও একটা কাজ এমন আছে যা আমরা কর্তব্য হিসাবেই করি। কিন্তু আল্লাহ পাক সে কাজের জন্য এমন এক সম্মানজনক নাম দিয়েছেন যা দ্বারা তাঁর পরম সন্তুষ্টিরই প্রকাশ হয়েছে। সে কাজটি হলো আল্লাহর পথে খরচ করা। এটা আমাদের উপর ফরয। আমরা আল্লাহর হুকুম পালন করি তাঁর সন্তুষ্টি পাওয়ার আশায়। কিন্তু তিনি মেহেরবানী করে আমাদের এ কাজকে উৎসাহ দেবার জন্য বলেন যে, আমার বান্দাহ আমাকে করয দিল।

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ـ

"এমন কে আছে যে আল্লাহকে করযে হাসানা দেবে?"

(সূরা আল বাকারাহ ২৪৫ ও সূরা আল হাদীদ ১১ আয়াত)

আল্লাহর পথে দান করাকে তিনি এজন্য করয বলেন যে, তিনি এর বদলা দেবেন এবং যা দান করা হয়েছে তার চেয়ে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন। অর্থাৎ তিনি ফেরত দেবেন বলেই দানকে করয গণ্য করেন। আমরা তাঁরই দেয়া মাল দান করি। অথচ তিনি এটাকে করয হিসাবে মর্যাদা দেন।

আমরা কি আল্লাহকে ধার দিচ্ছি বলে মনে করে দান করি? তা কখনো নয়। তেমনি আমরা আল্লাহকে সাহায্য করছি মনে করে দাওয়াতী কাজ করি না। কিন্তু এ কাজ যারা করে তাদেরকে তিনি আদর করে আনসারুল্লাহর মর্যাদা দান করেন।

ওয়ালীউল্লাহর চেয়ে আনসারুল্লাহ আল্লাহর বেশী প্রিয়

কেউ যদি আল্লাহর ওয়ালীর গুণাবলী অর্জন করেন, কিন্তু দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজ না করেন, তাহলে আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হন না। একটি বিখ্যাত হাদীস একথা প্রমাণ করে। আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল (আঃ)-কে একটা এলাকা ধ্বংস করার হুকুম দিলেন। জিবরাঈল (আঃ) সেখানে গিয়ে

তারা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য বলে তারা কখনও মন্দ কাজ করে না। তাই তাদের দোযখে যাওয়া বা শাস্তি পাওয়ার কোন কারণ নেই। তাদের পুরস্কার পাওয়ারও কথা নয়। কারণ তারা যত ভাল কাজই করুন তাতে তাদের কোন কৃতিত্ব নেই। তারা সবই বাধ্য হয়ে করেন। কিন্তু জিন ও মানুষকে ভাল বা মন্দ কোনটা করার জন্যই আল্লাহ বাধ্য করেননি। তাদেরকে ইখতিয়ার দিয়েছেন যে নিজের ইচ্ছায় ভাল বা মন্দ করতে পারবে। তাই তারা পুরস্কার বা শাস্তি পাবে। মন্দ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ভাল করায় তাদের কৃতিত্ব আছে বলেই পুরস্কার পাবে। আর ভাল করার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মন্দ করায় তারা দোষী বলেই শাস্তি পাবে।

কিন্তু জিন ও মানুষের মধ্যে আবার পার্থক্য আছে। আল্লাহ তাআলা জিনের উপর আল্লাহর দীন পালনের কর্তব্য আরোপ করলেও জিনকে খিলাফতের দায়িত্ব দেননি। খিলাফতের দায়িত্ব শুধু মানুষের উপরই দেয়া হয়েছে। এখন খিলাফতের এ দায়িত্বটা কী তা বুঝা দরকার।

খেলাফতের দায়িত্ব

আল্লাহ তাআলা যত কিছু সৃষ্টি করেছেন তাদের প্রত্যেকের জন্য বিধান বা নিয়ম-কানুন তৈরী করেছেন। মহা শক্তিশালী বিশাল সৃষ্টি সূর্য থেকে শুরু করে অণু-পরমাণু পর্যন্ত প্রতিটি সৃষ্টি তার জন্য স্রষ্টার দেয়া নিয়ম বাধ্য হয়ে মেনে চলে। ঐ নিয়ম পালন না করে নিজের মরযী মতো চলার ক্ষমতা কারো নেই। তাদেরকে মানা বা না মানার কোন ইখতিয়ার দেয়া হয়নি। গোটা সৃষ্টি জগত আল্লাহর রচিত নিয়মের রাজত্বের সম্পূর্ণ অধীন।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا -

মানুষ কি আল্লাহর বিধান ছাড়া (অন্য বিধান) তালাশ করে? অথচ আসমানও জমীনে যা কিছু আছে সবাই আল্লাহর নিকট বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পন করেছে।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা এ কথাই বলতে চান যে হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে আমার রচিত বিধানকে মানতে বাধ্য করিনি বলে কি তোমরা সে বিধানকে অমান্য করে চলতে চাও? তোমরা জেনে রাখ যে, আর সবাই আমার দেয়া বিধান মেনে চলছে। কারণ তাদেরকে আমি মানতে বাধ্য করেছি। তারা মানতে বাধ্য বলেই তাদের কোন বাহাদুরী নেই এবং কোন মর্যাদারও অধিকারী

নয়। কিন্তু তোমাদেরকে আমি সম্মান ও মর্যাদা দিতে চাই। সেটা হলো আমার খিলাফতের মর্যাদা।

আমার রচিত বিধান গোটা সৃষ্টি জগতে আমি নিজেই জারী করি। সে বিধান আমি কোন নবীর মারফতে তাদের কাছে পাঠাইনি। কিন্তু হে মানুষ, তোমাদের জন্য রচিত বিধান আমি নবীর মারফতে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি। এবং তা আমি নিজে জারীও করি না। সে আইন ও বিধান আমারই রচিত। আমার ঐ আইনকে আমার পক্ষ থেকে আমার পছন্দনীয় নিয়মে জারী করার দায়িত্ব আমি নবী ও তাঁর প্রতি ঈমানদারদের উপর দিয়েছি।

হে মানুষ, তোমরা যদি নবীর মাধ্যমে প্রেরিত বিধানকে আমার পক্ষ থেকে জারী কর, তাহলে তোমরা আমার খলীফার মর্যাদা পাবে, যে মর্যাদা আমি জ্বিন ও ফেরেশেতাকে দেইনি। এ মর্যাদা ও সম্মান পাওয়ার সুযোগ দেবার জন্যই আমি তোমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছি।

তাই আল্লাহর খলীফার মর্যাদা পেতে হলে আল্লাহর আইন কায়েমের জন্য চেষ্টা করতে হবে। ইসলামী আন্দোলন আল্লাহর আইন কায়েমের জন্যই সংগ্রাম করে যাচ্ছে। আল্লাহর আইন কায়েমের জন্য যে ধরনের সৎ লোক দরকার এ আন্দোলন সে মানের লোক তৈরী করার জন্যই কর্মীদেরকে এক বিশেষ রুটীন মেনে চলার জন্য ব্যবস্থা করেছে। রাসূল (সাঃ) ১৩ বছর পর্যন্ত লোক তৈরী করার পর মদীনায় আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলাদেশে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের জন্য ইসলামী আন্দোলন ঐ নিয়মেই কাজ করে যাচ্ছে।

প্রসংগক্রমে মানুষকে খিলাফতের যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে বিষয়ে দুটো অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ কথা আলোচনা করা দরকার।

মানুষের জন্যই পৃথিবীর সৃষ্টি

১। আল্লাহ তাআলা গোটা সৃষ্টিজগতকে ব্যবহার করার ক্ষমতা মানুষকে দিয়েছেন। তাই এ পৃথিবীর সব কিছু মানুষের জন্য পয়দা করা হয়েছে বলে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছেঃ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا -

"হে মানুষ, তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদের জন্য সব কিছু পয়দা করেছেন যা পৃথিবীতে আছে।" (সূরা আল বাকারাহ ২৯ আয়াত)

মানুষ যাতে নিজের ইচ্ছা মতো আল্লাহর সৃষ্টিজগতকে ব্যবহার করতে পারে, সে জন্যই এত ক্ষমতা মানুষকে দেয়া হয়েছে। সত্যিই চিন্তা করে দেখলে বুঝা যায় যে, মানুষকে আর কোন সৃষ্টির প্রয়োজনে পয়দা করা হয়নি, আর সবকেই মানুষের জন্য পয়দা করা হয়েছে। যেমন পশু –পাখী, গাছ–পালা, আগুন–পানি, চন্দ্র–সূর্য, বাতাস–ইথার ইত্যাদি ছাড়া মানুষের চলে না বলেই এ সব পয়দা করা হয়েছে। কিন্তু মানুষ না থাকলে ঐ সব সৃষ্টির কোন অসুবিধা হতো না। তাই মানুষ সৃষ্টির আগেই আসমান–যমীনের সব কিছু পয়দা করা হয়েছে যাতে মানুষের কাজে লাগে। মানুষ ছাড়া যদি তাদের না চলতো, তাহলে মানুষ পয়দা হবার আগে তারা কেমন করে বেঁচে ছিল?

পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু ও শক্তি মানুষের প্রয়োজনে পয়দা করার কারণেই একমাত্র মানুষই বিজ্ঞানের উন্নতি করছে। জিন জাতি বিজ্ঞান চর্চা করে সৃষ্টিজগতকে নিজেদের জন্য এভাবে ব্যবহার করেছে বলে কোন প্রমাণ নেই। দুনিয়ার যত বস্তু ও বস্তুগত শক্তি রয়েছে তা জানা ও মানুষের কাজে লাগানোই হলো বিজ্ঞানের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব মানুষ পালন করে।

মানুষ শুধু খলীফা

২। খলীফার নিজস্ব মালিকানা ক্ষমতা নেই। সে যার খলীফা মালিকানা তারই। সে হিসাবে মানুষ দুনিয়ায় খলিফা হিসাবে প্রেরিত হবার অর্থ হলো এই যে তাকে কারো না কারো খলীফাই হতে হবে। খলীফা হওয়াই দুনিয়ায় তার একমাত্র মর্যাদা। এখানে মনিব হওয়ার কোন সুযোগ তার নেই।

তাই যদি মানুষ আল্লাহর খলীফার মর্যাদা হাসিলের চেষ্টা করে, তবেই তার সম্মান বহাল থাকবে এবং আখিরাতেও মর্যাদার অধিকারী হবে। কিন্তু যদি সে এ বিষয়ে অবহেলা করে, তাহলে সে যোগ্যতা থাকলে ইবলীসের খলীফা হবে। যদি সে যোগ্যতাও না থাকে, তাহলে ইবলীসের কোন মানুষ–খলীফার খলীফা হবে। কিন্তু তাকে খলীফাই হতে হবে। তার আর কিছু হবার উপায় নেই।

কুরআন পাকের একটি আয়াত থেকে এর মযবুত প্রমাণ পাওয়া যায়।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط

"হে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছ, তোমরা পুরাপুরি ইসলামে দাখিল হও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।"

(সূরা আল বাকারা–২০৮ আয়াত)

এ আয়াতটি বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে আল্লাহ পাক বলছেন, যারা ঈমানদার হওয়ার দাবীদার, তাদের জীবনের সব ব্যাপারেই ইসলামের বিধান মেনে চলা কর্তব্য। যদি জীবনের কোন এক দিকে তোমরা ইসলামের বিধান কবুল না কর, তাহলে সে দিকটা খালি পড়ে থাকবে না। সেখানে তোমরা কোথাও না কোথাও থেকে বিধান নিতে বাধ্য হবে। ইসলাম ছাড়া আর যেখান থেকেই কোন বিধান নেবে সেটা অবশ্যই হয় ইবলীসের তৈরী, আর না হয় তার কোন খলীফার তৈরী। বিধান শুধু দু'জায়গায়ই আছে, হয় আল্লাহর বিধান মান, তা না হলে তোমার অজান্তেই তুমি ইবলীসের পাল্লায় পড়বে। অর্থাৎ হয় আল্লাহর খলীফা হও, নইলে ইবলীসের খলীফা হতে হবে। তোমার খলীফা হওয়া ছাড়া আর কিছুই হবার উপায় নেই।

এ কারণেই যে সত্যিকার মুসলিম, সে জীবনের সব ক্ষেত্রেই মুসলিম থাকার চেষ্টা করে। এক ব্যক্তি ধর্মের দিক দিয়ে মুসলিম, রাজনৈতিক দিক দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পুঁজিবাদী বা সমাজতন্ত্রী, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ভোগবাদী, দর্শনে বস্তুবাদী, সমাজতত্ত্বে দ্বান্দ্বিকতাবাদী হতে পারে না। ইসলামী জীবন বিধানকে কবুল করলে জীবনের সকল দিকেই তাকে মুসলিম হতে হবে।

ইসলামী আন্দোলন পূর্ণ ইসলাম চায়

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন দীনের কোন একাংশের খেদমতের জন্য কাজ করছে না, পূর্ণ দীনকে কায়েমের কর্মসূচী নিয়ে সংগ্রাম করছে। তাই আল্লাহর আইন কায়েম করার জন্য এক দল সৎলোক তৈরী করার উপযুক্ত রুটীনই কর্মীদেরকে দিয়েছে।

আল্লাহ তাঁর মু'মিন বান্দাহদের জন্য যে চারটি মর্যাদার কথা তাঁর পাক কালামে উল্লেখ করেছেন তার সব কয়টি হাসিল করার সুযোগই ইসলামী আন্দোলনে রয়েছে। ইকামাতে দীনের আন্দোলন ছাড়া একই সাথে এ চারটি মর্যাদা পাওয়ার আর কোন উপায়ই নেই। আন্দোলন ও সংগঠনে যোগদান না করে যাঁরা ব্যক্তিগত চেষ্টায় আল্লাহর দাস হবার চেষ্টা করে, তাদের পক্ষে বেশী

অগ্রসর হওয়া অসম্ভব এবং তাদের উন্নতিও অতি ধীর গতিতে হবে। আর যারা কোন হাক্কানী পীরের সহায়তায় সাধনা করতে থাকে, তারা হয়তো আল্লাহর ওয়ালীর মর্যাদাও পেতে পারে। কিন্তু বাকী দুটো মর্যাদা কী করে পাবে? তাবলীগ জামায়াতে কাজ করে আনসারুল্লাহর আংশিক মর্যাদা পেলেও খুলাফাউল্লাহর মর্যাদা বাকী থেকে যায়। তাবলীগ জামায়াতের দাওয়াত ইসলামের ধর্মীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ বলে সেখানে কাজ করে আনসারুল্লাহর পূর্ণ মর্যাদা পাওয়ার আশা করা যায় না।

এ কারণেই বাতিলের সাথে মুকাবিলা করে এবং আল্লাহর কাছে জান ও মাল বিক্রয় করে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার আন্দোলনে ইসলামের সাথে আজীবন লেগে থাকা ছাড়া ইবাদুল্লাহ, আওলিয়াউল্লাহ, আনসারুল্লাহ ও খুলাফাউল্লাহর মর্যাদা হাসিল করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

সৎলোক কি আর কোথাও তৈরী হয় না?

আল্লাহর আইন কায়েমের জন্য আন্দোলনে যোগদান না করে কি সৎ লোক তৈরী করা সম্ভব নয়? মাদ্রাসায় যে আলিম পয়দা হয়, পীরের খানকায় যে আল্লাহওয়ালা তৈরী হয় এবং তাবলীগ জামায়াতের মাধ্যমে যে দীনের জন্য মেহনতকারী সৃষ্টি হয় তারা কি ইকামাতে দীনের যোগ্য বলে গণ্য হতে পারে না?

এ বিষয়ে পয়লা কথা হলো যে, ইকামাতে দীন ও খেদমতে দীনের মধ্যে যে পার্থক্য তা ভাল করে বুঝতে হবে। মাদ্রাসা, খানকাহ ও তাবলীগ জামায়াত নিঃসন্দেহে দীনের বড় বড় খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছে। এ সব প্রতিষ্ঠানে যে ধরনের লোক তৈরী হচ্ছেন তারা অবশ্যই ইকামাতে দীনের সহায়ক হতে পারেন। কিন্তু শুধু ঐটুকু কর্মসূচীর ফলে দ্বীন কায়েম হবে না। যদি হতো তাহলে বিগত শত শত বছরে এর প্রমাণ পাওয়া যেতো।

তাই আল্লাহর আইন কায়েমের জন্য যে ধরনের লোক তৈরী করা দরকার, তার জন্য উপযোগী কর্মসূচী প্রয়োজন। আর এ জাতীয় কর্মসূচী যখনই ময়দানে চালু করা হয়, তখন স্বাভাবিক কারণেই বাতিল শক্তি এর বিরুদ্ধে লেগে যায়। মাদ্রাসা, খানকাহ ও তাবলীগের কর্মসূচীকে বাতিল শক্তি তাদের জন্য বিপজ্জনক মনে করে না, তাই তাদের বিরুদ্ধে বাতিলের পক্ষ থেকে বাধা সৃষ্টি

করা প্রয়োজন মনে করে না। বাতিলের আইন, শাসন ও কর্তৃত্ব পরিবর্তন করে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের কর্মসূচীকে বাতিল শক্তি কিছুতেই বরদাশত করে না। তাই হক ও বাতিলের মধ্যে সংঘর্ষ ও টক্কর হয়। নবীদের জীবনই একথার সাক্ষী। মানুষ হিসাবে নবীগণকে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত চরিত্রের বলে সবাই স্বীকার করতো। কিন্তু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এমনকি ধর্মীয় নেতৃত্বের অধিকারীরাও একজোট হয়ে নবীগণের বিরোধিতা করেছে।

আল্লাহর আইন কায়েমের জন্য যে ধরনের লোক দরকার তা হক ও বাতিলের সংঘর্ষের মাধ্যমেই শুধু যোগাড় হয়। কুরআন পাকে এ বিষয়ে বহু জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে। এ সংঘর্ষ শুধু ইসলামী আন্দোলনের সাথেই হয়ে থাকে। মাদ্রাসা, খানকাহ ও তাবলীগের সাথে এ সংগর্ষ হয় না।

মাদ্রাসা, খানকাহ ও তাবলীগ সরাসরি ইকামাতে দীনের কর্মসূচী নিয়ে কাজ না করলেও এ সব প্রতিষ্ঠান দীনের যে বিরাট খেদমত করছে তা ইকামাতে দীনের খুবই সহায়ক শক্তি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মাদ্রাসা থেকে আলিম হয়ে যারা ইসলামী আন্দোলনে আসেন, তাদের মধ্যে কুরআন-হাদীসের ইলম থাকার কারণে তারা অল্প দিনেই নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের যোগ্য বিবেচিত হন। মাদ্রাসাগুলো আছে বলেই ইসলামী আন্দোলন বিরাট সংখ্যক রেডীমেড আলেম পেয়ে গেছে।

খানকাহ ও তাবলীগে যারা আছেন, তারা মন-মগয ও চরিত্রে ইসলামী হবার কারণে তারা যদি ইসলামী আন্দোলনে শরীক হন, তাহলে অন্যদের তুলনায় তারা অল্প সময়ে যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হন। তাদের মধ্যে যারা সরাসরি আন্দোলনে যোগদান করেন না, তারাও আল্লাহর আইন কায়েম হওয়ার পক্ষেই জনগণের নিকট মতামত প্রকাশ করেন। ইসলামী শাসন কায়েম হলে খানকাহ ও তাবলীগের লোকই সবার আগে সে আইন মানার জন্য এগিয়ে আসবেন। ইসলামী আন্দোলন আল্লাহর আইন কায়েমের যোগ্য লোক তৈরী করছে। আর মাদ্রাসা, খানকাহ ও তাবলীগ জামায়াত আল্লাহর আইন মানবার যোগ্য জনতা তৈরী করছে। সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে এ কথা ভাল করে খেয়াল রাখতে হবে যে, ঐ সব দীনী প্রতিষ্ঠান আমাদেরই সহকারী ও সহযোগী শক্তি। সাধারণ অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে আল্লাহ, রাসূল (সাঃ) ও

কুরআনের প্রতি যেটুকু মহব্বত আছে তা ঐ সব প্রতিষ্ঠানেরই অবদান। তাদের এ বিরাট খেদমতকে ছোট করে দেখা অত্যন্ত অন্যায়।

ঐ সব প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত কিছু লোক ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করেন বলে ঐ সব প্রতিষ্ঠানকে এজন্য দায়ী করা চলে না। যারা বিরোধিতা করেন, তাদেরকে ইসলামের বিরোধী মনে করলে মস্ত বড় ভুল হবে। তাঁরা বিভিন্ন কারণে বিরোধিতা করে থাকেন। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে তাদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। তাদেরকে দীনের খাদেম হিসাবে শ্রদ্ধা করতে হবে। সম্মানের সাথে তাদের সাথে ব্যবহার করতে হবে। ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে তাদের ভুল ধারণা দূর করার উপযোগী বইপত্র তাদের খেদমতে পেশ করতে হবে।

আমরা যদি ইখলাসের সাথে দীনের দায়িত্ব পালন করতে থাকি ও আমাদের আমল-আখলাক যদি ইসলাম অনুযায়ী উন্নত করতে পারি এবং মসজিদের ইমাম, মাদ্রাসার ওস্তাদ, খানকার পীর, তাবলীগ জামায়াতের মুবাল্লিগদের দ্বারা দীনের যে খেদমত হচ্ছে আমরা যদি এর কদর করি, তাহলে যাঁরা বিরোধিতা করছেন, তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পারবেন। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মনে রাখতে হবে যে, দীনের সামান্য খেদমতও যাঁরা করছেন, তাঁরাই আমাদের বন্ধু ও সহায়ক। আমরা তাঁদেরকে মহব্বত করতে থাকলে তাঁরা একতরফা বিরোধিতা কতদিন করবেন? ইসলাম বিরোধী শক্তির মুকাবিলায় তাঁরাই তো ইসলামী শক্তির অংশ।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সহীহ জযবা

শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনে যারা যোগদান করে শয়তান তাদেরকে তার রাজ্যের দুশমন মনে করে। তাই সে কর্মীদেরকে এ কাজ থেকে ফিরাবার চেষ্টা করে। যখন ফিরাতে পারে না, তখন কর্মীর দিলে এমন সব খেয়াল ঢুকিয়ে দেয় যার ফলে দায়ী ইলাল্লাহর সহীহ জযবা হারিয়ে ফেলে। আন্দোলনের যোশীলা ও উৎসাহী কর্মী হওয়া সত্ত্বেও সঠিক জযবার অভাবে সে এমন আচরণ করে যা আন্দোলনের উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী করে। এ কারণেই দায়ী ইলাল্লাহর সহীহ জযবার পরিচয় ভালভাবে বুঝে নিতে হবে।

দায়ী ইলাল্লাহর মনে আল্লাহর গুমরাহ বান্দাহদের প্রতি দরদ থাকা জরুরী। এ দরদের ভাবটা এই যে, "আমাকে তো আল্লাহ পাক তাঁর দীনের পথে চলার তাওফীক দিলেন। কিন্তু যারা এখনও এ পথ চিনল না, তাদের কী উপায় হবে? তাদেরকে দোযখ থেকে বাঁচাবার জন্য আমাকে চেষ্টা করতেই হবে। আমার চেষ্টার ফলে যদি কেউ হিদায়াত পায়, তাহলে আমার উপর আল্লাহ পাক যে পরিমাণ খুশী হবেন তার চেয়ে বড় সম্পদ আর কিছুই নেই। আল্লাহর এ সন্তুষ্টি হাসিল করার জন্য আমাকে দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজ দরদের সংগেই করতে হবে।"

এটাই হলো ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর সহীহ জযবা। নবীগণ এ মহান জযবা নিয়েই মানুষকে আল্লাহর পথে ডেকেছেন। এ জযবার অভাব হলে কর্মীর মধ্যে এমন কিছু রোগ সৃষ্টি হয়, যার ফলে সে এ পথে বেশী এগুতে পারে না। বরং তার আচরণ দ্বারা আন্দোলনেরও ক্ষতি হয়ে যায়।

১। ইসলাম সম্বন্ধে কিছুদিন পড়াশুনা করার ফলে যখন মোটামুটি জ্ঞান লাভ হয়, তখন কর্মী বেশ উৎসাহ বোধ করে। ইসলাম পরিচিতি, ঈমানের হাকীকত, ইসলামের হাকীকত, নামায-রোযার হাকীকত ও এ জাতীয় কতক বই থেকে ইসলামের উজ্জ্বল আলো পেয়ে সে খুবই মুগ্ধ হয়। ইসলামকে এমন চমৎকারভাবে বুঝবার ফলে সর্বত্রই এ সব বইয়ের প্রশংসা করতে থাকে। সবাইকে এ সব পড়ার জন্য দাওয়াত দেয়।

কিন্তু কোন কোন কর্মীর দ্বারা বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তখন যখন সে আলিম, ইমাম ও পীরদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে থাকে যে, এরা ইসলামের কী জানে? এদের মুখে কোনদিন ইসলাম সম্পর্কে এমন সুন্দর ব্যাখ্যা শুনিনি। এরা কালেমাটা পর্যন্ত ঠিক মতো বুঝাতে পারে না। নামায-রোযাকে শুধু পূজা পাঠ বানিয়ে রেখেছে। ইসলামকে শুধু ধর্ম মনে করে। ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসাবে তারা পেশ করে না। এ মোল্লারাই ইসলামকে ডুবাল।"

তার চিন্তা করা উচিত যে, এসব মন্তব্য দ্বারা কি দীনের কোন উপকার হতে পারে? কর্মীর এ আচরণ অনেক দীনদার ও আলিমকে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী বানিয়ে দেয়। তারা তখন প্রচার করেন যে, এ সব বই পড়লে বে-আদব হয় এবং আলেম-উলামার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি নষ্ট হয়। তাই তাঁরা এ সব বই না পড়ার জন্য জনগণকে উপদেশ দেন। তাঁরা মানুষকে ইসলামী আন্দোলন থেকে ফিরিয়ে রাখে। এভাবে কর্মীর ঐ সব বিরূপ মন্তব্য ইসলামী আন্দোলনের বিরাট ক্ষতির কারণ হয়েদাঁড়ায়।

ইসলামের উজ্জ্বল আলোর সন্ধান পাওয়ার পর কর্মীর মনে দরদ থাকলে এ জযবা সৃষ্টি হওয়া উচিত যে, "আমাদের আলিম সাহেবদের খেদমতে এ সব বই পৌছাতে হবে। তাঁরাই তো জনগণের নিকট ইসলামের কথা বুঝান। মসজিদে, খানকায় ও ওয়ায মাহফিলে তাঁরা জনগণের নিকট আরও সুন্দরভাবে ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরবার জন্য এ বই থেকে উপকৃত হবেন।"

২। ইসলামী আন্দোলনের মহান নেতা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রঃ)-এর বিরুদ্ধে যখন কোন আলিম আপত্তিকর কথা বলেন, তখন স্বাভাবিক কারণেই কর্মীদের মনে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এ বিষয়ে কর্মীদের সবর করা ছাড়া উপায় নেই। বিরোধিতাকারী আলিমদের সম্পর্কে কর্মীরা অনেক সময় মন্তব্য করে বলে যে, "যে সব বই পড়ে ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা পেলাম এর মহান লেখকের বিরুদ্ধে যারা ফতওয়া দেয় বা অশালীন কথা বলে তাদের কাছ থেকে তো আমরা ইসলামের কোন শিক্ষাই পাইনি। তারা বলেন যে, "মওদূদীর ইসলাম সঠিক নয়।" যারা এ কথা বলেন, তাদের কাছে কোন ইসলাম আছে কিনা তাইতো জানা যায় না। তারা আমাদেরকে ইসলাম শেখাননি। এখন আমরা শেখার চেষ্টা করছি তাতেও বাধা দিচ্ছেন।"

কর্মীদেরকে মনে রাখতে হবে যে, তাঁরা মাওলানা মওদূদীর (রঃ) বিরুদ্ধে মন্দ বলার জন্য আল্লাহর কাছে দায়ী হবেন। কিন্তু কর্মীরা

তাঁদের বিরুদ্ধে এ সব মন্তব্য করে আন্দোলনের কী উপকার করবেন? তাঁদের সম্পর্কে সবর করা ও চুপ করে থাকাই মাওলানা মওদূদীর (রঃ)নীতি।

আমরা শুধু ইতিবাচক কাজ করে যাব। কোন দীনী মহল সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করা থেকে কর্মীদেরকে সযত্নে বিরত থাকতে হবে। একদিন ইন-শা-আল্লাহ তাঁদের ভুল ভাংগবে।

৩। যখন ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব কর্মীদের বুঝে আসে এবং এ কাজ যে সব ফরযের বড় ফরয উপলব্ধি করে, তখন শয়তান তাদের মনে প্রশ্ন সৃষ্টি করে যে, "তাহলে আলিম হয়েও যারা এ কাজ করে না তারা কেমন আলিম? আর যারা এভাবে ইসলামকে বুঝে না তারা আবার কেমন মুসলমান?

এ জাতীয় প্রশ্নের ভিত্তিতে কোন কোন কর্মী এমন বিরূপ মন্তব্য করতে থাকে যেন সে মুফতীর দায়িত্ব পালন করছে এবং ফতওয়া দিয়েবেড়াচ্ছে।

দরদী মনের কর্মী কখনও এভাবে চিন্তা করে না। সে চিন্তা করে যে, "আমিও তো আগে ইসলামকে বুঝতাম না। আল্লাহর এক বান্দাহ আমাকে বুঝাবার চেষ্টা করেছে বলে আজ আমার বুঝে এসেছে। তাই যারা ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝেনি তাদেরকে বুঝাবার দায়িত্ব আমাকেই পালন করতে হবে। আলিম হয়েও এ কাজের গুরুত্ব যে বুঝেননি, তাকে বুঝাবার চেষ্টা করা তাদেরই দায়িত্ব যারা বুঝে।

আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আমরা দায়ী ইলাল্লাহর দায়িত্ব পালন করছি। কারো উপর ফতওয়া জারীর দায়িত্ব আমাদের নয়। আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে আমরা এ পথ চেনার সৌভাগ্য লাভ করেছি। যারা এ পথ এখনও চেনেনি, তাদেরকে আমরা চেনাতে চেষ্টা করলেই আমাদের উপর আল্লাহর ঐ মেহেরবানীর সত্যিকার শুকরিয়া আদায়ের কাজ হবে।